দ্য টিচার

দ্য টিচার

মূল : ফ্রিডা ম্যাকফ্যাডেন

অনুবাদঃ রুহুল আমিন

একমাত্র পরিবেশক
এশিয়া পাবলিকেশনস
৩৮/২ক বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট), ৩য় তলা, ঢাকা-১১০০

প্রস্তাবনা

কবর খোঁড়া কঠিন কাজ।

আমার পুরো শরীর যন্ত্রণায় কাতর। এমন সব পেশিতে ব্যথা লাগছে, যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কেও আগে জানতাম না। প্রতিবার যখন শাবল তুলে মাটি সরাই, তখন মনে হয় যেন কোনো ধারালো ছুরি আমার পিঠের পেশিতে গেঁথে বসছে। এমন একটা গভীর পেশি, যেটা আমি এতদিন শুধু হাড় বলে ধরে নিয়েছিলাম। ভুল ভেবেছিলাম বোধ হয়। এখন প্রতিটি পেশির অস্তিত্ব টের পাচ্ছি, এবং প্রতিটিই যেন চিৎকার করছে।

একটু থেমে যাই। শাবলটা হাত থেকে নামিয়ে রাখি, হাতের তালুতে ফেটে ওঠা ফোস্কার একটু রেহাই দিতে চাই। কপালের ঘামটা কনুই দিয়ে মুছি। সূর্য ডোবার পর ঠান্ডা এতটাই নেমে গেছে যে, মাটিতে পাতলা বরফের আস্তরণ জমেছে। কিন্তু ঠান্ডাটা আমি আর অনুভব করি না। প্রথম আধঘণ্টা পরই সইয়ে নিয়েছি। এমনকি প্রায় এক ঘণ্টা আগে জ্যাকেটটাও খুলে রেখেছি।

যত গভীরে যাচ্ছি, মাটি তত নরম হচ্ছে। ওপরের স্তরটা ছিল শক্ত, ভেদ করা কষ্টকর। তবে তখন তো পাশে একজন সঙ্গী ছিল। এখন আমি একা।

না, একা না ঠিক। আমি আর একটি মৃতদেহ। কিন্তু ও তো আর সাহায্য করবে না। আমি চোখ কুঁচকে তাকাই গহীন অন্ধকারে, কবরে। দেখতে যেন নিঃশেষ এক অতল গহ্বর—কিন্তু বাস্তবে গভীরতা দু'ফুটের বেশি না। আর কতটা গভীর করতে হবে? শুনেছি, আসল কবর নাকি ছয় ফুট গভীর হয়। তবে সেটা তো কবরস্থানের জন্য—এরকম অচিহ্নিত গোপন কবর, তাও আবার জঙ্গলের মাঝে, তার জন্য নিশ্চয়ই আলাদা হিসাব চলে। তবু এখানে যা চাপা পড়বে, তা কোনোভাবে আবিষ্কৃত হওয়া চলবে না—তাই যত গভীর, তত ভালো।

আমি ভাবতে থাকি—একটা দেহ কতটা গভীরে পুঁতলে বন্যপ্রাণীরা তার গন্ধ পাবে না?

একঝাপটা ঠান্ডা বাতাস ঘামের পাতলা স্তরটাকে শীতল করে দেয়, আমি কেঁপে উঠি। প্রতিমুহূর্তে তাপমাত্রা আরও নিচে নামছে। আবার কাজে ফেরার সময় হয়েছে। আরেকটু গভীর করে খুঁড়ে নিই—নিরাপদ থাকবে।

আমি আবার শাবল তুলে নিই। শরীরের প্রতিটা ক্লান্ত পেশি যেন আর্তনাদ করে ওঠে। তবে এই মুহূর্তে আমার তালুগুলো জ্বলন্ত ব্যথায় সবার

চেয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানায়। একটা চামড়ার দস্তানা যদি পেতাম! কিন্তু আমার কাছে আছে কেবল একজোড়া মোটা, ফোলানো গ্লাভস, যেগুলো পরলে শাবল ধরা যায় না ঠিকঠাক। তাই খালি হাতেই কাজ চালাতে হচ্ছে—ফোস্কা, যন্ত্রণা সব সঙ্গী করে।

যখন গর্তটা অগভীর ছিল, তখন উপরে দাঁড়িয়েই খুঁড়ে নিতে পারতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই—গর্তের ভেতর নেমে খুঁড়তে হচ্ছে। কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা—এটা কোনো শুভ লক্ষণ নয়। শেষমেশ আমরা সবাই একদিন এখানে যাব, তবে ভাগ্যকে কেউই আগেভাগে ডাকতে চায় না। কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই।

আমি আবার শাবলের ধারালো ফলা গেঁথে দিই শুষ্ক, শক্ত মাটিতে। ঠিক তখনই আমার কান খাড়া হয়ে যায়। আশেপাশে নীরবতা—শুধু বাতাসের শব্দ—তবু আমি নিশ্চিত কিছু একটা শুনেছি।

কঠিন শব্দ!

আবারও একটা টোকা, যেন কোনো শুকনো ডাল ভেঙে গেল। বোঝা যাচ্ছে না, সামনে না পেছনে, ঠিক কোথা থেকে আসছে শব্দটা। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই, চোখ কুঁচকে তাকাই অন্ধকারের দিকে। কেউ কি আছে এখানে?

যদি থাকে, তবে আমি বড়সড়ো ঝামেলায় পড়ে গেছি।

“কে?”—গলা শুকনো হয়ে এসেছে, কাঁপা কাঁপা স্বরে ডাক দিই।

কোনো সাড়া নেই।

আমি ডান হাতে শাবলের হাতলটা শক্ত করে ধরি। কান পেতে শুনি। শ্বাস বন্ধ করে রাখি, যেন নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও না শুনি।

টুক!

আবারও ভাঙার শব্দ—এবার নিঃসন্দেহে কোনো ডাল। এবং এবার আগের চেয়েও কাছে।

এবং এখন... আমি স্পষ্ট শুনতে পাই—পাতার মচমচে শব্দ। কেউ বা কিছু চলাফেরা করছে খুব কাছেই।

আমার পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতি থেকে আর রক্ষা নেই। কথার মারপ্যাঁচে বাঁচার সুযোগ নেই, মিথ্যে বলে ভুল বোঝাবুঝির নাটক সাজানোও অসম্ভব। যদি কেউ আমাকে এই অবস্থায় ধরে ফেলে—সব শেষ। হাতকড়া পড়বে হাতে, পুলিশের গাড়িতে সাইরেন বাজবে, আজীবন জেল... মুক্তির কোনো সুযোগ নেই। ঠিক যেন সিনেমার মতো, কিন্তু এবার সেটা আমার জন্য বাস্তব।

তবু ঠিক তখনই চাঁদের আলোয় দেখতে পাই—একটা কাঠবিড়ালি ছুটে যাচ্ছে ঝোপ থেকে খোলা জায়গার দিকে। ছোট্ট শরীরটা দৌড়ে পাশ

কাটিয়ে যাওয়ার সময় আরেকটা শুকনো ডাল মচকে ওঠে তার ভারে। কাঠবিড়ালিটা যত তাড়াতাড়ি এসেছিল, ঠিক তত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় ঝোপের আড়ালে, আর চারপাশ আবার নিঃশব্দ হয়ে যায়—মরণঘাতী নিঃশব্দ।

তাহলে মানুষ নয়। বনেরই একটি ছোট্ট প্রাণী ছিল সেটা। যেটাকে আমি মনে করেছিলাম পায়ের শব্দ, সেটা আসলে ছিল ছুটে বেড়ানো ছোট্ট থাবার আওয়াজ।

আমি ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলি। তাৎক্ষণিক বিপদ হয়তো কেটে গেছে, কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়। এখন বিরতি নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার খোঁড়া শুরু করতে হবে।

কারণ, এই দেহটা আমাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতেই হবে— সূর্য ওঠার আগেই।

পার্ট-১

অধ্যায় এক
বর্ণনা—ইভ

তিন মাস আগে

সবসময় সবাই আমাকে বলে, আমি নাকি খুব ভাগ্যবতী। তারা বলে, আমার দারুণ একটা বাড়ি আছে, তৃপ্তিকর একটা পেশা আছে, এমনকি আমার জুতাগুলো নিয়েও তারা প্রশংসা করতে ভোলে না কেউ।

কিন্তু আমি তো জানি আসল কথা। লোকজন যখন বলে আমি ভাগ্যবতী, তখন তারা আমার বাড়ি কিংবা ক্যারিয়ার বা জুতার কথা বলছে না। তারা আসলে আমার স্বামীকে নিয়ে কথা বলছে।

তারা বলছে নেট-এর কথা।

নেট দাঁত ব্রাশ করতে করতে নিজ মনে গুনগুন করছে। প্রায় এক বছর ধরে আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে সকালে দাঁত ব্রাশ করেছি, তারপর হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলাম—ও সবসময় একই গান গায়। এলভিস প্রিসলির 'অল শুক আপ'।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন এই একটা গানই গায় সে।

সে হেসে বলেছিল, তার মা শিখিয়েছিল—এই গানটা ঠিক দুই মিনিটের, আর দাঁত ব্রাশ করতে হয় নাকি ঠিক সেই সময়টুকুই।

এই গানটা এখন আমি নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করি।

প্রতিদিন, সেই একই অভিশপ্ত গান—টানা আট বছর ধরে! এই সমস্যার সমাধান আমি হয়তো করতেই পারতাম—যদি আমরা একসঙ্গে দাঁত ব্রাশ না করতাম। কিন্তু প্রতিদিন সকালে আমরা একই সময়ে দাঁত ব্রাশ করি। কারণ, আমরা একই সময়ে বাসা ছাড়ি। আর যাচ্ছিও একই জায়গায়।

নেট বেসিনে টুথপেস্ট ফেলল, তারপর মুখটা ধুয়ে নিল। আমি আগেই দাঁত ব্রাশ শেষ করে ফেলেছি, তবু ওর পাশে একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

নেট মাউথওয়াশের বোতলটা তুলে নিল, ঝাঁঝালো নীল তরলটা গার্গল করতে লাগল।

"আমি বুঝি না তুমি কীভাবে এটা মুখে দাও," আমি বলি। "মাউথওয়াশ তো আমার কাছে অ্যাসিডের মতো লাগে।"

ও গার্গল শেষ করে সেটা বেসিনে ফেলে দিয়ে হাসল।

ওর দাঁত একেবারে নিখুঁত—সোজা আর ঝকঝকে সাদা, কিন্তু অতটা নয় যে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

"সতেজ লাগে। গরল থেকেও তো পবিত্রতা জরুরি," বলল সে।

"এটা ভয়ংকর," আমি কেঁপে উঠি। "ওটা দিয়ে কুলকুচি করার পর আমাকে কিন্তু চুমু খেও না।"

নেট হেসে ওঠে। হয়তো ব্যাপারটা মজার, কারণ ও তো আমাকে তেমন একটা চুমুই খায় না।

সকালে বাসা ছাড়ার সময় একটা দায়িত্বসর্বস্ব চুমু, সন্ধ্যায় দেখা হলে আরেকটা, আর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আরেকটা।

দিনে তিনটা চুমু।

আমাদের যৌন-জীবনটাও একইভাবে সময়সূচিবদ্ধ—প্রতি মাসের প্রথম শনিবার।

আগে হতো প্রতি শনিবার, তারপর এক সপ্তাহ পরপর, আর গত দুই বছর ধরে চলছে মাসে একবার নিয়মে।

মন চায় আমাদের শেয়ার করা আইফোন ক্যালেন্ডারে "রেকারিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট" হিসেবেই সেট করে দিই।

আমি হেয়ার ড্রায়ারটা তুলে নিই, চুল সামান্য যে ভেজা আছে তা শুকিয়ে নিই। নেট নিজের বাদামি খাটো চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে শেভ করতে শুরু করে।

আমরা দুজনই আয়নায় মুখোমুখি, আর সেখানে তাকিয়ে থাকলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই—নেট আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

বিতর্কের কোনো জায়গাই নেই।

আমার স্বামী অবিশ্বাস্য রকমের হ্যান্ডসাম। তার জীবন নিয়ে যদি কোনো সিনেমা বানানো হয়, তাহলে হলিউডের সবচেয়ে লাস্যময় অভিনেতারাই দৌড়াবে চরিত্রটা পেতে।

চুলগুলো খাটো কিন্তু ঘন বাদামি, কাটা-কাটা চোয়াল, এক পাশ একটু বেঁকে থাকা মিষ্টি হাসি, আর এখন তো বেজমেন্টে ওজন তুলে তুলেও পেশিগুলো জমাট বাঁধছে।

আর আমি? আমি একেবারেই সাধারণ। তিরিশটা বছর সময় পেয়েছি ব্যাপারটা মেনে নেওয়ার জন্য, আর এখন পুরোপুরি মানিয়েও নিয়েছি যে, আমার মলিন বাদামি চোখে নেটের চোখের মতো ঝিলিক থাকবে না কখনও, আমার নিস্তেজ চুলগুলো মাথায় স্রেফ ঝুলে থাকবে, কোনোদিনও কোনো স্টাইল পাবে না, আর আমার মুখের প্রতিটা অঙ্গই যেন ভুল মাপে তৈরি।

আমি খুবই রোগা—তীক্ষ্ণ কোনা-কানায় ভরা, কোনো গোলাকার সৌন্দর্য নেই আমার গড়নে।

আমার জীবন নিয়ে যদি কোনো সিনেমা বানানোর চিন্তা কেউ করত—আসলে সে চিন্তাটাই অবান্তর।

আমার মতো মেয়েদের নিয়ে কেউ সিনেমা বানায় না।

লোকজন যখন বলে আমি ভাগ্যবতী, তখন আসলে তারা বলতে চায়—নেট আমার সাধ্যের অনেক বাইরের কেউ।

তবে আমি নেটের চেয়ে একটু ছোট, এটুকু অন্তত আমার পক্ষে যায়।

আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে পোশাক পরতে শুরু করি, নেটও পেছন পেছন আসে।

আমি একটা খাসা সাদা ব্লাউজ পরি, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো, আর সঙ্গে নিই ট্যান রঙের একটা স্কার্ট।

নিউ ইংল্যান্ডে স্কার্ট পরার সময় বড়জোর তিন মাস, ভাগ্য ভালো হলে চার।

প্যান্টিহোজ পরে নিই, তারপর পা গলিয়ে দিই একটা কালো জিমি চু স্টিলেটো জুতোয়।

জুতো পরে দাঁড়াতেই দেখি, নেট আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর বাদামি টাই-টা গলায় আলগা ঝুলছে।

"ইভ," বলে সে।

আমি জানি ও কী বলবে। আশা করি বলবে না।

"হুঁ?"

"এগুলো কি নতুন জুতো?"

"এগুলো?" আমি চোখ তুলেও তাকাই না। "না। বহু বছরের পুরোনো। মনে হয়, গত বছরের স্কুলের প্রথম দিনেই পরেছিলাম।"

"ও। ঠিক আছে..."

সে বিশ্বাস করে না।

তবু নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে নেয়—বাদামি চামড়ার লোফার, সত্যিই বহু পুরোনো—আর কিছু বলে না।

নেট রাগ করে কখনও চিৎকার করে না।

মাঝেমধ্যে ধমক দেয়, যদি কিছু 'না করার' মতো কাজ করি, কিন্তু এখন তো সেটাও প্রায় বলে না।

আমার স্বামী আশ্চর্যরকম ধীরস্থির স্বভাবের।

এই জায়গাটায় আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

নেট তার শার্টের হাতার বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘড়ির দিকে তাকায়।

"তুমি রেডি? নাকি ব্রেকফাস্ট নেবে?"

নেট আর আমি দুজনেই কেসহ্যাম হাইস্কুলে পড়াই। আর আজ এ বছরের স্কুলের প্রথম দিন।

আমি গণিত এবং নেট ইংরেজি শেখায়।

ও এখন সম্ভবত পুরো স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক—বিশেষ করে আর্ট টাটল চলে যাওয়ার পর।

আমার বন্ধু এবং সহকর্মী শেলবি বলেছিল, সিনিয়র মেয়েরা স্কুলের 'সবচেয়ে হট পাঁচ শিক্ষক'-এর একটা তালিকা করেছিল, আর সেখানে নেট ছিল এক নম্বরে। বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল সে।

সাধারণত আমরা একসঙ্গে স্কুলে যাই না।

এক জায়গা থেকে রওনা হয়ে একই জায়গায় পৌঁছেও আলাদা গাড়িতে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু নেট স্কুলে আমার চেয়ে বেশি সময় থাকে, আর আমি আটকে পড়তে চাই না।

তবে যেহেতু আজ স্কুলের প্রথম দিন, তাই একসঙ্গেই যাচ্ছি।

"চলো," আমি বলি। "স্কুলে গিয়ে কফি খাবো।"

নেট মাথা নাড়ে।

ও কখনও ব্রেকফাস্ট করে না—ওর মতে, সকালে খেলে পেটের গড়মিল হয়।

আমার জিমি চু হিলজোড়া মেঝেতে ঠকঠক শব্দ তুলে এগিয়ে চলে—দোতলা বাড়িটার সামনের দরজার দিকে হাঁটছি আমি।

আমাদের বাড়িটা ছোট—দুইজন শিক্ষকের বেতনে যেটুকু সম্ভব, সেটুকুই কেনা হয়েছে।

তবু অনেক দিক থেকে এটা আমার স্বপ্নের বাড়ি।

তিনটা শোবার ঘর আছে এখানে, আর নেট প্রায়ই বলে—বাকি ঘর দুটো শিশুদের জন্য রাখবে, খুব শিগগিরই।

যদিও আমাদের বর্তমান ঘনিষ্ঠতার সময়সূচি অনুযায়ী, সেটা কীভাবে সম্ভব হবে, আমি বুঝি না।

এক বছর হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়েছি—ভাবলাম দেখি কী হয়।

এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, সেটা মূলত কিছুই না।

নেট গিয়ে বসে ওর হোন্ডা অ্যাকর্ড-এর ড্রাইভারের সিটে। আমরা একসঙ্গে কোথাও গেলে সবসময় ওর গাড়িতেই যাই, আর সবসময় ও-ই চালায়।

এটাও আমাদের রুটিনেরই একটা অংশ—

প্রতিদিন তিনটা চুমু, মাসে একবার মিলন, আর সবসময় নেটই ড্রাইভ করে।

আমি তো দারুণ ভাগ্যবতী, তাই না?

একটা সুন্দর বাড়ি, পরিপূর্ণ এক পেশা, আর একজন স্বামী—যিনি শান্ত, ভদ্র আর অভূতপূর্ব রকমের সুদর্শন।

আর যখন নেট গাড়িটা রাস্তার দিকে চালিয়ে নেয়, স্কুলের পথ ধরে, তখন আমার মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খায়—

ইশ, যদি কোনো ট্রাক স্টপ সাইন ভেঙে এসে আমাদের গাড়িকে উড়িয়ে দিয়ে যায়, আর আমরা দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে মরে যাই...

অধ্যায় দুই
বর্ণনা-অ্যাডি

আমি যেকোনোকিছু করতে পারতাম—শুধু যদি এই গাড়ি থেকে নামতে না হতো।

আমি আমার সব চুল কেটে ফেলতাম। ওয়ার অ্যান্ড পিস পড়ে শেষ করতাম। এমনকি নিজেকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েও দিতাম—শুধু যেন কেসহ্যাম হাইস্কুলের সেই ভয়ংকর দরজাগুলো পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে না হয়।

আমি যতই বলি, ততই কম হয়ে যাবে—আমি স্কুলে যেতে চাই না।

"পৌঁছে গেছি!"—আমার মা অতিরিক্ত হাসিখুশি গলায় বললেন। একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, কারণ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আমরা স্কুলের সামনেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে আছি। আমি অতটা বোকা নই, যদিও গত বছর যা-ই ঘটে থাকুক না কেন।

আজ সকালেই মা নিজে আমাকে স্কুলে নিয়ে এসেছেন তাঁর ধূসর মাযদা গাড়িতে। আমার মনে হয়, তিনি জানতেন যে আমি যদি গত দুই বছরের মতো আজও সাইকেল নিয়ে বের হতাম, তাহলে স্কুলে পৌঁছানোর কোনো সম্ভাবনাই থাকত না। তাই তিনি আজ তাঁর নার্সের চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে নিজেই পাহারাদার হয়ে এসেছেন—আমার প্রথম দিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য।

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আমি জানালা দিয়ে লাল ইটের চারতলা বিল্ডিংটার দিকে তাকাই—গত দুই বছরে যা আমার জীবনের এক অনিবার্য অংশ হয়ে উঠেছে। আমি চোখ কচলাই—ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, কারণ আজ ঘুম ভেঙেছে 'অযৌক্তিক সময়ে', ঠিকঠাক সময়ে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য।

স্মৃতিতে ভেসে আসে, কেসহ্যাম হাইস্কুলে-এ নবম শ্রেণির প্রথম দিনটার কথা। আমি কতটা উত্তেজিত ছিলাম তখন! আর আমি স্কুলটাকে পছন্দ করতাম, আমি খুব জনপ্রিয় ছিলাম না, পড়ালেখাতেও খুব ভালো ছিলাম না, তবে সবকিছু মিলিয়ে অভিজ্ঞতা মোটেও খারাপ ছিল না।

...যতক্ষণ না সবকিছু একেবারে ভেঙে পড়ে।

পুরো গ্রীষ্মকাল আমি পার করেছি প্রতিবেশীদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। পাশাপাশি, মায়ের কাছে বারবার অনুরোধ করেছি—কোনোভাবে যেন আমাকে স্কুলে না ফিরতে হয়।

কিন্তু কেসহ্যাম শহরে একটাই পাবলিক হাইস্কুল। আর প্রাইভেট স্কুলগুলোর খরচ আমাদের সাধ্যের বাইরে। অন্য কোনো শহরের স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবা

যেত, কিন্তু সাইকেলে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, আর স্কুল বাসও তো সেসব এলাকা থেকে কাউকে তুলবে না।

মা একটু করে ধৈর্য হারিয়ে আমাকে এ কথাগুলো বুঝিয়েছেন বারবার।

"হয়তো..." আমি একটু আশা নিয়ে বলি, "আমি হোমস্কুলড হতে পারি?"

"অ্যাডি," মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "চলো, আর না।"

"তুমি বুঝছো না।" আমি আমার ব্যাকপ্যাকটা বুকে জড়িয়ে ধরি, কিন্তু সিটবেল্ট খোলার কোনো উদ্যোগ নেই। "সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।"

"ওরা তোমাকে ঘৃণা করবে না। কেউ কিছু মনে রাখেনি পর্যন্ত।"

আমি ঠাট্টার ভঙ্গিতে নাক সিঁটকাই। মা কখনো কোনো হাইস্কুল স্টুডেন্টের সাথে কথা বলেছেন নাকি?

"আমি সিরিয়াস," মা গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেন, যদিও আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে গাড়ি রেখে নামা নিষেধ। যেকোনো মুহূর্তে কেউ এসে চেঁচিয়ে উঠবে, গাড়িটা সরাও।

"টিনএজাররা শুধু নিজের ব্যাপারেই আগ্রহী থাকে। গত বছরে কী হয়েছে, কেউ তেমন মনে রাখে না। কেউ পাত্তাও দেয় না।"

কী ভুল কথা। কতটা বোকামির মতো ভুল।

ঠিক তখনই পেছন থেকে একটা হর্ন বাজে। প্রথমে একবার, তারপর আরেকটা, তারপর মনে হয় কেউ একজন গিয়ে হর্নে হাত রেখেই বসে আছে, উঠবে না আর কোনোদিন।

"আমি একটু সরে গিয়ে দাঁড়াই?" মা অসহায় কণ্ঠে বলেন, আবার ইঞ্জিন চালু করেন।

কিন্তু তাতে কী? গাড়ি সরালেই বা কী হবে? মা শুধু আমাকে একটা উৎসাহমূলক বক্তৃতা দেবেন।

আমি মোটিভেশনাল স্পিচ চাই না। আমি চাই একটা নতুন স্কুল।

আর যদি সেটা না হয়, তাহলে এ সবই বৃথা—নিরর্থক।

"থাক, দরকার নেই," আমি ধীরে ধীরে বলি।

যখন আমি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি, মা তখন আমার নাম ধরে ডাকছেন, কিন্তু আমি পিছন ফিরে তাকাই না।

মা নিরর্থক। মুখে অনেক সুন্দর কথা বলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় না।

গত বছরে যা ঘটেছে, তার পরিণতি তাঁকে বইতে হয় না।

আমি যা করেছি—তার ফল তাঁকে ভোগ করতে হয় না।

মাযদা থেকে নেমেই আমি টের পাই—চারপাশের সব চোখ যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

এই স্কুলে অনেক মেয়েই আছে যারা ইচ্ছা করেই নজরে পড়তে চায়, কিন্তু আমি কখনোই সেরকম ছিলাম না।

আমি সবসময় চাইতাম ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে।

আজও তাই—আমার পরনে সাদামাটা সোজা কাটের জিন্স আর ধূসর টি-শার্ট, তার ওপর আরও ফিকে রঙের হুডি।

কেসহ্যাম হাইস্কুলে একটা নিয়ম আছে—প্যান্টের পেছনে কোনো লেখালেখি থাকা চলবে না (এই নিয়মে অনেক মেয়েই ক্ষুব্ধ)।

কিন্তু আমার শুধু পেছন নয়—পুরো পোশাকেই কোথাও একফোঁটা লেখাও নেই।

আমি নিশ্চিত করেছি—কোনোকিছুর মাধ্যমে যেন কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়।

তবু যেন প্রতিটা চোখ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

এই মুহূর্তে একমাত্র ইতিবাচক দিক হচ্ছে—মাকে গাড়ি নিয়ে সরে যেতে হয়েছে।

মানে, তাঁকে এখন অন্তত দেখতে হচ্ছে না সবাই কীভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, কীভাবে ফিসফিস করছে যখন আমি ব্যাকপ্যাকটা এক কাঁধে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে সামনে হাঁটছি।

আমি জানতাম, এমন কিছুই হবে।

কেউ কিছু মনে রাখবে না—এই কথা মা কী করে বিশ্বাস করেন? কোন গ্রহে বাস করেন উনি?

আমি জানি তারা কী বলছে, তাই থেমে শোনার প্রয়োজন বোধ করি না। আমি চোখ নিচু করে, কাঁধ গুটিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি হেঁটে যাই। কারও চোখে চোখ পড়তে দিই না।

তবু শুনতে পাই ফিসফিসানি—

ওই মেয়েটা। অ্যাডি সেভারসন। জানো না ও কী করেছিল? ও-ই সেই...

উফফ, একদম সহ্য হয় না। কী বিশ্রী ব্যাপার!

প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি। আরেকটু হলেই কোনো ঝামেলা ছাড়াই স্কুল বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়তাম। সামনে ভাঙাচোরা লাল রঙের দরজাগুলো দেখা যাচ্ছে—এখনও কেউ আমার মুখের ওপর কিছু বলেনি।

তারপরই আমি ওকে দেখি।

ও মানে কেনজি মন্টগোমারি। আমাদের জুনিয়র ক্লাসের সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়ে। আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দরী। ক্লাস প্রেসিডেন্ট, চিয়ারলিডার দলের প্রধান—এই ধরনের মেয়ে।

স্কুলের সিঁড়ির ওপর বসে আছে সে, পরনে এমন একটি স্কার্ট, যা প্রায় নিশ্চিতভাবেই স্কুলের ড্রেস কোড ভঙ্গ করছে—যে নিয়ম অনুযায়ী স্কার্ট বা শর্টস কখনোই হাতে ঝুলন্ত আঙুলের চেয়ে ছোট হতে পারবে না।

অনেক মেয়েকেই এই নিয়ম ভাঙার জন্য বাসায় পাঠানো হয়েছে, কিন্তু কেনজিকে কখনোই পাঠানো হবে না। এই ব্যাপারে বাজি রাখা যায়।

তার চারপাশে বসে আছে তার 'দলের' মেয়েরা—যেন স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের একঝলক।

আর একটা নতুন মুখ আছে ওদের সঙ্গে, যাকে গত বছর ওদের সাথে দেখা যেত না—হাডসন জানকোভস্কি, নতুন তারকা কোয়ার্টারব্যাক।

কেনজি আর তার বন্ধুরা প্রায় পুরো পথটাই আটকে রেখেছে, তবে সামান্য একটু জায়গা আছে পাশ দিয়ে যাওয়ার জন্য।

আমি যখন সেই একফুট জায়গা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ কেনজির চোখ আমার চোখে পড়ে এক মুহূর্তের জন্য।

আর ঠিক তখনই সে ইচ্ছে করে নিজের ব্যাকপ্যাকটা ফেলে দেয় সেই ফাঁকা জায়গায়, আমার পথ রুদ্ধ করে।

ধাক্কা লাগল, মনে হলো।

সে ঠিক করে চার ইঞ্চির মতো জায়গা রেখেছে, যেটুকু দিয়ে আমি কোনোভাবে গুঁতোগুঁতি করে পার হওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

আমি চাইলে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যেতে পারতাম, কিন্তু সেটা মানে হলো সব সিঁড়ি নিচে নেমে আবার নতুন সিঁড়ি বেয়ে ওঠা—আর আমি তো প্রায় উপরে পৌঁছে গেছি।

আর ব্যাপারটা এমনও না যে, সেখানটায় কোনো মানুষ বসে আছে।

শুধু একটা জঘন্য ব্যাকপ্যাক।

তাই, কেনজি যখন তার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে, আমি চেষ্টা করি তার লেদার ব্যাগটার পাশ দিয়ে চুপিচুপি সরে যেতে...

"এক্সকিউজ মি!"

কেনজির কণ্ঠ থামিয়ে দিল আমাকে মাঝপথেই।

ওর বড় বড় নীল চোখ দুটো উঠে এসেছে আমার দিকে—চোখের চারপাশে ঘন, কালো পাতলা পাপড়ি।

আমি কেনজিকে প্রথম দেখি মিডল স্কুলে, ইতিহাস ক্লাসে। তখনই মনে হয়েছিল—এটাই সম্ভবত আমার নিজের চোখে দেখা সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ।

সুন্দর মেয়ে আগে দেখেছি, কিন্তু কেনজি যেন অন্য কোনো গ্রহের জীব।

সে লম্বা, শরীরটা স্লিম আর ছিপছিপে, সোনালি-সিল্কের মতো ঝকঝকে চুলগুলো কোমর ছুঁই ছুঁই করছে।

তার প্রতিটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেন আমার যেকোনো গুণের চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষণীয়।